আত্মহত্যা প্রতিরোধযোগ্য: সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে

রুবিনা জাহান রুমী

আমরা প্রতিদিনই পত্রিকা, টেলিভিশন কিংবা অনলাইনে আত্মহত্যার খবর পড়ি। খুব মন খারাপ করে ভাবি কেন মানুষটা আত্মহত্যা করল? কী দুঃখ ছিল? স্তব্ধ হয়ে হয়ত কিছুক্ষণ বসে থেকে ভাবি। কিন্তু আমরা বিষয়টি নিয়ে কথা খুব কমই বলি। আত্মহত্যা কথাটা শুনলেই আমাদের মাঝে কেমন যেন একটা অনুভূতি কাজ করে। বেশির ভাগ সময়ই ব্যাপারটা চেপে যাই। কিন্তু এই এড়িয়ে যাওয়া বা চেপে যাওয়ার ফলে কী হচ্ছে? আত্মহত্যার হার কি কমে যাচ্ছে কোনভাবে? মোটেই না। বরং নানান কারণে মানুষের আত্মহত্যাপ্রবণতা বেড়েই চলছে দিনদিন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে, যা বৈশ্বিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রতি ১০ লাখে ১৬ জন অথবা প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজনের মৃত্যুর কারণ। গত ৪৫ বছরে আত্মহত্যার হার বিশ্বব্যাপী ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক দেশে ১৫-৪৪ বছর বয়সীদের মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে আত্মহত্যার অবস্থান তৃতীয় এবং ১০-২৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার অবস্থান দ্বিতীয়। এই পরিসংখ্যানে আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা অন্তর্ভুক্ত নয়, যা আত্মহত্যার তুলনায় ২০ গুণ বেশি সংঘটিত হয়। বাংলাদেশও এই ঝুঁকির বাইরে নয়। আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে যদিও এখনো পর্যাপ্ত স্টাডি নেই, তারপরও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশেও আত্মহত্যার হার বেড়েই চলেছে।

কেন মানুষ আত্মহত্যা করে বা করতে চায়?

আত্মহত্যার প্রধান উদ্দেশ্য মরে যাওয়া নয় বরং কোন একটি বিশেষ কষ্ট বা যন্ত্রণাকে শেষ করার তীব্র ইচ্ছা। একজন আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের মাঝে থাকে একরাশ হতাশা, অসহায়ত্ব, একাকীত্ব, সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা এবং অপূরণীয় অনিশ্চয়তা। বেঁচে থাকার চেয়ে যখন মরে যাওয়াকেই সহজ মনে হয়, যখন মনে হয় আর কোন উপায় নেই সমস্যা সমাধানের, ঠিক এরকম পরিস্থিতিতেই একজন মানুষ আত্মহত্যার মতো একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ব্যানক্রফট (১৯৭৯)-এর মতে, "কোন আন্তর্ব্যক্তিগত ক্ষতি বা দন্দ্বের মতো কঠিন সমস্যায় মানুষ সাধারণত আত্মহত্যাকেই একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে প্রত্যক্ষণ করে।" ক্ষতি, লজ্জা বা অপমানের মতো মানসিক কষ্ট থেকে পালানোর জন্য আত্মহত্যা একটি সহজ উপায় বলে ধরে নেয় অনেকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়, আত্মহত্যা এমন একটি অবস্থা যেখানে মৃত্যুর মাধ্যমে একজন মানুষ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে বা করতে চায়। মানসিক রোগের কারণেও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকে। ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া, বর্ডারলাইন পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার, এলকোহলিজম বা ড্রাগ অ্যাবিউজের মতো মানসিক রোগে হতাশা একটি বড় বিষয়, যার ফলেও ঘনঘন আত্মহত্যা ঘটে থাকে। অর্থনৈতিক সমস্যার চাপ কিংবা আন্তর্ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঝামেলাও অনেক সময় এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আত্মহত্যার নির্দিস্ট কোন কারণ খোঁজা ভুল। এটা সম্পূর্ণভাবে একজন মানুষের জীবনপ্রবাহের উপর নির্ভর করে। কখনো কখনো একটি ঘটনাই ব্যক্তিকে আত্মহত্যাপ্রবণ করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনেকগুলো ঘটনার সামষ্টিক ফল। আত্মহত্যা মূলত জৈবিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটি জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফল। আত্মহ্যার নির্দিস্ট কোন বয়স নেই। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই আছে আত্মহত্যার ঝুঁকিতে। নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, বৃদ্ধ-যুবক/যুবতী, গ্রামীণ-শহুরে সবাই আত্মহত্যা করতে পারে।

আত্মহত্যার সতর্ক সংকেত বা Warning Signs

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে অধিকাংশ মানুষ যারা আত্মহত্যার চিন্তা করে তারা সত্যিকার অর্থে মরতে চায় না। যা হয় সেটা হলো, তারা একটা কঠিন সমস্যায় পড়ে এবং তার সমাধানের কোন পথ না পেয়ে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়। একজন মানুষ যখন মানসিকভাবে খারাপ থাকে কিংবা কোন সমস্যায় পড়ে, এরকম সময়ে সে সবসময়েই কোন না কোনভাবে সংকেত দেয় যে তার জীবনে কিছু একটা ঠিক হচ্ছে না, বা সে ভালো নেই। যারা আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করে তারা সবসময়েই তাদের আচরণে এরকম কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করে। এই লক্ষণসমূহকেই সতর্ক সংকেত বা Warning Signs বলা হয়। একটা মানুষ কতখানি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে আছে তা প্রথমিকভাবে এই ওয়ার্নিং সাইনের মাধ্যমেই নির্ধারণযোগ্য। এই সাইনগুলো বলে দেয় কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা নাকি কয়েক দিনের মাঝে সে আত্মহত্যার প্ল্যান করছে। একারণে আত্মহত্যার ওয়ার্নিং সাইনগুলো সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিলেই কেবল আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব। American Association of Suicidology-র গবেষণায় নিম্নোক্ত প্রধান ওয়ার্নিং সাইন উঠে এসেছে।

আত্মহত্যা বা মৃত্যুসংক্রান্ত কাজ : যে কোন কাজ যেমন সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ, লেখা, সাধারণ কথা সবকিছুতেই মৃত্যুর ছাপ থাকা। নিজের প্রিয় জিনিস যেগুলো কখনো কারো সাথে শেয়ার করা হতো না হঠাৎ করেই সেগুলো অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া। কিংবা কারো সাথে ঝগড়া ছিল, বোঝা-পড়ায় ঝামেলা ছিল, হঠাৎই সেইসব মিটমাট করার জন্য চেষ্টা করা। সবার কাছে ক্ষমা চাওয়া। এই সবগুলোই আত্মহত্যার লক্ষণ।

কথাবার্তা: যারা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে তাদের বাক্যে বা কথায় হতাশা, নৈরাশ্য এমনকি সরাসরি মৃত্যুর কথা প্রকাশ পায়। যেমন:

— আমি আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই না।
— অন্যের বোঝা হতে হতে আমি ক্লান্ত।
— এগুলো আর কখনো ঠিক হবে না।
— আমাকে ছাড়াই সবাই ভালো থাকবে।

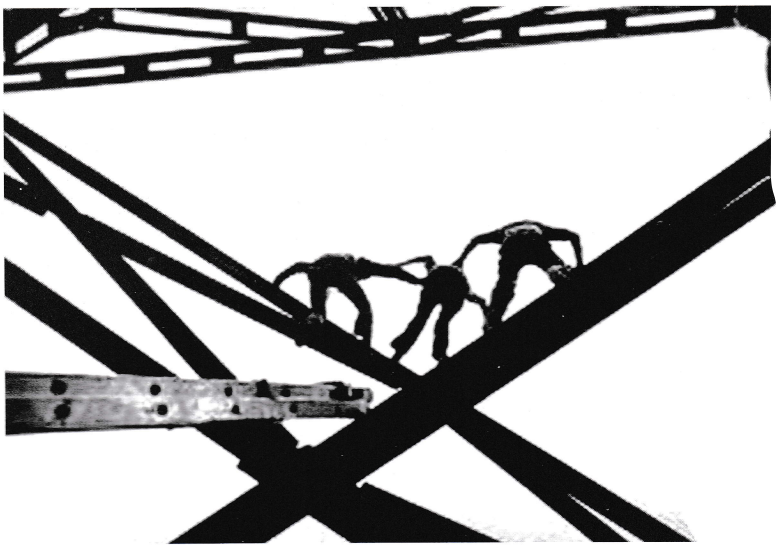

— আমি চলে গেলে কেউই আমাকে মিস করবে না।
— যদি আমি মরে যেতে পারতাম!
— এই ঘুম যদি আর না ভাঙত!
— আমাকে কেউ ভালোবাসে না।
— আমি একা কীভাবে বেঁচে থাকব?
— আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই।
— আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।

শারীরিক পরিবর্তন: খুব দ্রুত ওজন বেড়ে যাওয়া। হঠাৎ করেই নিজের যত্ন না নেয়া। কোন রকম পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখা। যেমন দুই দিনেও গোসল বা খাওয়া-দাওয়া না করা, দিনে একবারও আয়নায় মুখ না দেখা বা মাথার চুল অগোছাল, এলোমেলো পোশাক পরিধান করা। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দাগ, কাঁটা, আঁচড়, ঘা কিংবা ইনজেকশনের সূচের দাগ, যেগুলো জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারবে না।

আচরণে প্রচণ্ড পরিবর্তন: সামাজিক অনুষ্ঠান বা সমাবেশ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবার কাছ থেকে দূরে থাকা। কোন কাজে আনন্দ না পাওয়া। যে কাজগুলো করতে একসময় অনেক বেশি পছন্দ হতো হঠাৎ করেই সেইসব বন্ধ করে দেওয়া। সবসময় খুব মলিন, চিন্তিত বা বিরক্তভাব থাকা। খুব দ্রুত মনের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া, যেমন এই হাসি তো একটু পরেই মলিন মন বা কান্না করা। হঠাৎ করেই অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা। যেমন নিয়মিত ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও মারাত্মক সব কাজ করা। আচমকা এলকোহল বা ড্রাগস নিতে শুরু করা।

সাম্প্রতিক চাপমূলক ঘটনা: সম্প্রতি কোন ভালোবাসার মানুষের মৃত্যু কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ অথবা চাকরি হারানো। আগে আত্মহত্যার চেষ্টাও একটি বিশেষ কারণ হতে পারে। অথবা অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়া।

আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির সাথে করণীয়

যদি এরকম হয় যে আপনি কাউকে চিনেন বা জানেন যার মাঝে আত্মহত্যাপ্রবণ চিন্তা আছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির সকল কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমেই তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে যে সে আত্মহত্যার কথা ভাবছে কিনা? অথবা কোন পরিকল্পনা করেছে কিনা আত্মহত্যা করার জন্য। যদি পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে তা কীভাবে এবং কখন সে বাস্তবায়ন করবে বলে ভেবেছে। সবসময় মনে রাখতে হবে, কাউকে আত্মহত্যার প্রশ্ন করা মানে তার মাথায় আত্মহত্যার বীজ বপন করে দেওয়া নয়। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বরং এরকম সরাসরি প্রশ্ন করলে সে তার ভিতরের কথা বলার সুযোগ পাবে। সে অনুভব করতে পারবে যে কেউ একজন তার সমস্যা বা কষ্টের গভীরতা অনুভব করতে পেরেছে। এই স্তরের প্রত্যেকটা মুহূর্ত এবং আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একারণে সবসময় সচেতন থাকতে হবে যাতে আপনার কথায় বা কাজে কোনভাবেই ঐ ব্যক্তি আঘাত বা কষ্ট না পায়। এবং নরম Non-judgemental দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার সাথে কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি। এই স্তরেই একজন মানুষ কতোখানি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে আছে তা নির্ধারণ করা যায় এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায়। যদি কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করতে যাচ্ছে এরকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে সেক্ষেত্রে কয়েক ধাপে আপনাকে এগোতে হবে:

- যদি সম্ভব হয় তাহলে অন্য কাউকে (পরিবারের কেউ হলে ভালো হয়) জানানো এবং তার সাহায্য নেয়া। কারণ এসময়ে একা সবদিক বিবেচনা করে কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তাই কখনোই একা একা সব করতে দেওয়া যাবে না।
- তাৎক্ষণিকভাবে প্রফেশনাল সাহায্য নেয়া, যেমন ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করা।
- যথাযথ সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে একা ছাড়া যাবে না।
- অবশ্যই ব্যক্তিকে উপায় বা Lethal Means (যেমন দড়ি, বিষ, স্যাভলন, ব্লেড, চাকু, বন্দুক, হারপিক ইত্যাদি যা দিয়ে সে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেছিল) থেকে দূরে রাখতে হবে।
- এবং ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ না হওয়া তাকে সার্বক্ষণিকভাবে কারো তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।
- ছয় ধাপ বিশিষ্ট নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনা (Safety Planning)

এখন কথা হলো আমি নিজেই যদি থাকি আত্মহত্যার ঝুঁকিতে বা আমার নিজেরই যদি আত্মহত্যার চিন্তা আসে তাহলে কী করব? আমার বা আপনার মধ্যে কখনো কখনো আত্মহত্যার চিন্তা আসতেই পারে। তখনও আমাদের কিছু কাজ করার আছে যার মাধ্যমে আমরা অন্যের সাহায্য ছাড়াও প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যাপ্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারি। এক্ষেত্রেও আমাদের কতগুলো ধাপ মেনে এগোতে হবে:

১। ওয়ার্নিং সাইনগুলো চিনতে শেখা।

২। নিজের Internal Coping Strategy গুলোকে সক্রিয় করা, যার মাধ্যমে সহজে আত্মহত্যামূলক চিন্তা থেকে দূরে থাকা যায়।

৩। সামাজিক সম্পর্ক বাড়ানো এবং যারা আপনাকে মানসিক সহায়তা করতে পারবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা। এতে করে ক্রাইসিসের সময়টাতে মন অন্যদিকে সরানো সহজ হয়। একই সাথে অন্যরাও সাহায্য করার সুযোগ পাবে।

৪। পরিবার বা কাছের বন্ধুর সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা, যারা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দিতে পারবে এবং ক্রাইসিসের মুহূর্তে সর্বক্ষণ আপনার খেয়াল রাখতে পারবে।

৫। দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য প্রফেশনালদের সহায়তা নেয়া।

৬। পরিবেশ Lethal Means মুক্ত করা যাতে যখন-তখন আত্মহত্যার চেষ্টা করা না যায়।

প্রত্যেকটি জীবন মূল্যবান। একজন মানুষের আত্মহত্যার মধ্যদিয়েই এই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। তার পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রত্যেকটা মানুষের মাঝেই রয়েছে নিজনিজ সম্ভাবনা। আমরা চাইলেই এই সম্ভাবনাগুলোকে সুন্দর এক একটি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। শুধু দরকার সমষ্টিগত চেষ্টা। আত্মহত্যা নিয়ে এখনো আমাদের দেশে নানান রকম কুসংস্কার চালু আছে। মানুষ সহসা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চায় না। আমরা বলতে চাই না, আমরা শুনতেও চাই না। কিন্তু এই বৃত্ত থেকে বের হয়ে এসে আমাদের ভাবতে হবে, একসাথে কাজ করতে হবে। একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করতে হবে। শুধুমাত্র তাহলেই আমরা একটা বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে পারব। প্রত্যেকে নিজনিজ জীবনকে সুখী ও সুন্দর করতে পারব। আসুন আমরা সবাই আত্মহত্যা প্রতিরোধে এগিয়ে আসি। পথ চলাটা আপনাকে দিয়েই শুরু হোক।

সহকারী চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী; এম.ফিল পার্ট-I
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
E-mail : rumirj@gmail.com